◈ সূরা বনী-ইসরাঈল ◈

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ১১১

‘‘পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমন করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত- যার চারদিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি- যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই । নিশ্চয় তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল ।’’ আয়াত - ১ ।

মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত সফরকে ‘ইসরা’ ও সেখান থেকে আসমান পর্যন্ত সফরকে ‘মে’রাজ’ বলা হয় । পঁচিশ জন সাহাবীর কাছ থেকে মে’রাজের ঘটনার রেওয়ায়েত বর্ণিত হয় । ইনারা হলেন- হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব, আলী মর্তুজা, ইবনে মাসউদ, আবু জর গিফারী, মালেক ইবনে ছা’ছা, আবু হোরায়রা, আবু সায়ীদ, ইবনে আব্বাস, শাদ্দাদ ইবনে আউস, উবাই ইবনে কা’ব, আবদুর রহমান ইবনে কুর্য, আবু হাইয়্যা, আবু লায়লা, আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর, জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্, হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান, বুরায়দাহ্, আবু আইয়ূব আনসারী, আবু উমামা, সামুরা ইবনে জুনদুব, আবুল হামরা, সোহায়ব রুমী, উম্মে হানী, আয়েশা ও আসমা বিন্তে আবু বকর (রাঃ) । হযরত নবী করীম (সাঃ) মেরাজের এ সফর সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় করেন । সপ্ত আকাশ পর্যন্ত বিভিন্ন আকাশে এ সময় বিভিন্ন নবীদের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয় । এ সফরে তিনি ‘সিদরাতুল-মুন্তাহা’, বায়তুল মামুর ও দোজখ এবং বেহেশ্ত্ দেখেন । এ সময় তিনি জিবরাইল (আঃ) কে তার সরূপে দেখেন । এ সফরেই তার উম্মতের জন্য তাঁকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায উপহার দেওয়া হয় । বিভিন্ন আকাশে যেসব পয়গম্বরের সাথে সাক্ষাত হয়েছিল তাঁরাও তাঁর সাথে বায়তুল মোকাদ্দাসে অবতরণ করেন । এখানে হুজুরের ইমামতিতে তাঁরা সবাই নামায আদায় করেন । জিব্রাঈলের ইঙ্গিতে তাঁকে সবাই ইমাম বানিয়ে কার্যতঃ তাঁর নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমান দেয়া হয় । মেরাজের রাত্রে বায়তুল মোকাদ্দাসের প্রধান যাজক মসজিদের একটি দরজা বন্ধ করতে ব্যর্থ হয় ও পরদিন সকালে সেখানে এক জন্তুর পায়ের চিহ্ন দেখতে পায় , একজন অমুসলিম হয়েও সে পরবর্তীতে মেরাজের ঘটনার সাক্ষ্য দেয় । মে’রাজের তারিখ সম্পর্কে কিছু মতের অমিল থাকলেও বেশীর ভাগ সমর্থন রজব মাসের ২৭শে রাত্রিতে এবং এটাই সাধারন ভাবে প্রচলিত আছে ।

‘‘হযরত আবু যর গেফারী (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ বিশ্বের সর্ব প্রথম মসজিদ কোনটি? তিনি বললেন ঃ মসজিদে হারাম । অতঃপর আমি আরজ করলাম ঃ এরপর কোনটি? তিনি বললেন ঃ মসজিদে আকসা । আমি জিজ্ঞেস করলাম এতদুভয়ের নির্মানের মধ্যে কতদিনের ব্যবধান রয়েছে? তিনি বললেন ঃ চল্লিশ বছর ।’’ - মুসলিম ।

হযরত সোলায়মান (আঃ) জ্বিনদের সহায়তায় স্বর্ণ-রৌপ্য, মণি-মুক্তা ইয়াকুত ও যমরদ দ্বারা বায়তুল মোকাদ্দাস নির্মান করেন । পরবর্তীতে বনী ইসরাঈলের লোকেরা নাফরমানী, গোনাহ্ ও কুকর্মে লিপ্ত হয়ে গেলে আল্লাহ্ পাক তাদের উপর জালেমের অত্যাচার চাপিয়ে দেন এবং অগ্নি উপাসক তাদের উপর হত্যা ও লুটতরাজের রাজত্ব কায়েম করে । মসজিদের ধনসম্পদ লুণ্ঠিত হয় যা এখনও রোমের স্বর্ণমন্দিরে রক্ষিত আছে এবং থাকবে । শেষ যমানায় ইমাম মাহ্দী আবির্ভূত হয়ে এগুলো আবার বায়তুল মোকাদ্দাসে ফিরিয়ে আনবেন । এই সূরায় বনী ইসরাঈলীদের সাবধান করার মাধ্যমে বলা হয়েছে মানুষ যখন আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়ে যাবে, তখন তাদের শত্রু ও কাফেরদেরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে, যাদের হাতে তাদের উপাসনালয় ও মসজিদ সমূহেরও অবমাননা হবে । বায়তুল্লাহ্র রক্ষনাবেক্ষন ও কাফেরদের হাত থেকে একে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং গ্রহন করেছেন । কিন্তু বায়তুল মোকাদ্দাসের ক্ষেত্রে এ আইন নাই । মুসলমানরা যখন পথভ্রষ্টতা ও গোনাহে লিপ্ত হবে , তখন শাস্তি হিসেবে তাদের কাছ থেকে এ কেবলাও ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং কাফেররা এর উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে ।

‘‘ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন -কেয়ামতের দিন কোন কোন লোকের আমলনামা যখন তাদের হাতে দেওয়া হবে, তখন তারা তাদের কিছু কিছু সৎকর্ম তাতে অনুপস্থিত দেখে আরজ করবে ঃ পরওয়ারদেগার ! এতে আমার অমুক অমুক সৎকর্ম লেখা হয়নি । আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে উত্তর হবে ঃ আমি সেসব সৎকর্ম নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি । কারণ, তোমরা অন্যদের গীবত করতে ।’’ - মাযহারী ।

‘‘তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারো এবাদত করোনা এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর । তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে ‘উহ্’ শব্দটিও বলোনা এবং তাদেরকে ধমক দিওনা এবং বল তাদেরকে শিষ্টাচারপূর্ন কথা ।’’ আয়াত - ২৩ ।

رَبِّ ارْحَمْهُمَاكَمَا رَبَّيٰنِى صَغِيْرًا রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বা ইয়ানি সগীরা । আয়াত - ২৪

‘‘হে পালনকর্তা, তাঁদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন ।’’

বেদআত ও মনগড়া আমল যত ভালই দেখা যাক - গ্রহনযোগ্য নয় ঃ যে সৎকর্ম মনগড়া পন্থায় করা হয় - সাধারন বেদআতী পন্থাও এর অন্তর্ভুক্ত, তা দৃশ্যতঃ যতই সুন্দর ও উপকারী হোক না কেন - পরকালের জন্য উপকারী নয় ।

আল্লাহ্ তাআলা পিতা মাতার আদব, সম্মান এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করাকে নিজের এবাদতের সাথে একত্রিত করে ফরয করেছেন । আল্লাহ্ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার ন্যায় পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াও ওয়াজেব । হুজুরকে প্রশ্ন করা হয় আল্লাহ্র কাছে কোন কাজটি সবচেয়ে প্রিয়? তিনি বলেন ঃ ওয়াক্ত হয়ে গেলে নামায পড়া । আবার বলা হয় এর পর কোনটি প্রিয়? তিনি বলেন ঃ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার । হুজুর (সাঃ) বলেন ঃ পিতা জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা । এখন তোমাদের ইচ্ছা, এর হেফাজত কর অথবা একে বিনষ্ট করে দাও । তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত । তিনি আরো বলেন ঃ পিতা-মাতা উভয়েই তোমাদের জান্নাত অথবা জাহান্নাম । তিনি তিনবার বলেন ঃ যদি পিতা-মাতা সন্তানের প্রতি জুলুমও করে তবু পিতা-মাতার অবাধ্যতার কারনে সন্তান জাহান্নামে যাবে । এর সারমর্ম এই যে, পিতামাতার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহনের অধিকার সন্তানের নেই। যে সেবাযত্নকারী পুত্র পিতা-মাতার দিকে দয়া ও ভালবাসা সহকারে দৃষ্টিপাত করে, তার প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে সে একটি মকবুল হজ্বের সওয়াব পায় । সমস্ত গোনাহের শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা যেগুলো ইচ্ছা করেন কেয়ামত পর্যন্ত পিছিয়ে নিয়ে যান । কিন্তু পিতা-মাতার হক নষ্ট করা এবং তাদের প্রতি অবাধ্য আচরন করা এর ব্যতিক্রম । এর শাস্তি পরকালের পূর্বে ইহকালেও দেয়া হয় ।

যার পিতা-মাতা কাফের এবং তাকেও কাফের হওয়ার আদেশ করে এ ব্যাপারে তাদের আদেশ পালন করা জায়েয নয়, কিন্তু দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে হবে । হুজুরকে প্রশ্ন করা হয়, পিতা-মাতা ইন্তেকালের পরও তাদের কোন হক আমাদের জিম্মায় আছে কি? তিনি বলেন ঃ হাঁ তাদের জন্য দোয়া ও এস্তেগফার করা, তাঁরা কারো সাথে কোন অঙ্গীকার করে থাকলে তা পূরণ করা, তাঁদের বন্ধুবর্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাঁদের এমন আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখা, যাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক শুধু তাঁদেরই মাধ্যমে। কোরান পিতামাতার বার্ধক্যে সন্তানকে তার শৈশবকাল স্মরন করিয়ে দিয়ে বলছে, আজ পিতামাতা তোমার যতটুকু মুখাপেক্ষী, এক সময় তুমিও তদপেক্ষা বেশী তাদের মুখাপেক্ষী ছিলে । তখন তারা যেমন নিজেদের আরাম আয়েশ ও কামনা বাসনা তোমার জন্যে কোরবান করেছিলেন এবং তোমার অবুঝ কথা বার্তাকে স্নেহ-মমতার আবরন দ্বারা ঢেকে নিয়েছিলেন, তেমনি মুক্ষাপেক্ষীতার এই দুঃসময়ে বিবেক ও সৌজন্যবোধের তাগিদ এই যে, তাঁদের পূর্ব ঋণ শোধ করা কর্তব্য ।

‘‘ আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না । নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ ।’’ আয়াত - ৩২ ।

মানুষের মধ্যে লজ্জা-শরম না থাকলে সে মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় । অতঃপর তার দৃষ্টিতে ভালমন্দের পার্থক্য লোপ পায় । রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) লজ্জাকে ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সাব্যস্ত করেছেন । ব্যভিচার একটা সামাজিক অনাসৃষ্টি । এটা এত প্রসার লাভ করে যে, এর কোন সীমা পরিসীমা থাকে না । রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ সপ্ত আকাশ এবং সপ্ত পৃথিবী বিবাহিত যিনাকারদের প্রতি অভিসম্পাত করে । জাহান্নামে এদের লজ্জাস্থান থেকে এমন দুর্গন্ধ ছড়াবে যে, জাহান্নামীরাও তা থেকে অতিষ্ট হয়ে পড়বে । আগুনের আজাবের সাথে সাথে জাহান্নামে তাদের লাঞ্ছনাও হতে থাকবে ।

‘‘রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ তিনটি কারনে কোন ঈমানদার মুসলমানকে হত্যা করা যায়- (১) বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও যে যিনা করে , প্রস্তর নিক্ষেপে তাকে হত্যা করাই শরীয়তসম্মত শাস্তি (২) যে অন্যায়ভাবে কোন মানুষকে হত্যা করে (৩) যে ব্যাক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে ।’’ - বুখারী ও মুসলিম ।

আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে বিবেক বুদ্ধি ও ইচ্ছা শক্তি দান করেছেন এবং আযাব ও সওয়াবের পথ স্পষ্টভাবে বাতলে দিয়েছেন । কেউ যদি সেচ্ছায় আযাবের পথে চলারই ইচ্ছা ও সংকল্প গ্রহন করে, তবে আল্লাহ্র রীতি এই যে, তিনি তাকে সেই আযাবের উপায়-উপকরণাদি সরবরাহ করে দেন ।

অহংকার প্রকৃতপক্ষে মানুষের অন্তরের একটি কবীরা গোনাহ্ । অহংকারের অর্থ হচ্ছে নিজেকে অন্যের চাইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ এবং অন্যকে নিজের তুলনায় হেয় ও ঘৃন্য মনে করা ।

‘‘ তারা বলে ঃ যখন আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি নতুন করে সৃজিত হয়ে উত্থিত হব?’’
আয়াত - ৪৯ ।

বনী ইসরাঈলীরা যখন আল্লাহ্র একত্ববাদে প্রশ্ন তোলে ও হুজুরকে নানা ভাবে অযৌক্তিক প্রশ্নাদি করতে থাকে তখন এই সূরার মাধ্যমেই আল্লাহ্ পাক তাদের প্রশ্নের জবাব দিতে থাকেন । কেবল মাত্র মানুষই আল্লাহ্র নাফরমানী করে, এছাড়া প্রতিটি সৃষ্টিই নিয়তই আল্লাহ্র ধ্যানে মগ্ন । যেসব বস্তুবাদী নাস্তিক আল্লাহ্র অস্তিত্ব স্বীকার করে না তাদের অস্তিত্বের প্রতিটি অংশও বাধ্যতামুলক ভাবে আল্লাহ্র তসবীহ্ পাঠ করছে । মৃত্যুর পরে মানুষ যখন নূতন জীবন দেখবে, তখন অনিচ্ছাকৃত ভাবে তাদের মুখ থেকে আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা ও গুনবাচক বাক্য উচ্চারিত হবে, কিন্তু তখন তাতে আর কোন কাজ হবে না ।

‘‘নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি; তাদেরকে উত্তম জীবনাপোকরণ প্রদান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি ।’’
আয়াত -৭০ ।

আদমকে সেজদা করতে বলায় ইবলীস বলেছিল, আপনি মাটিকে অগ্নির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করলেন কেন? আরো বলেছিলো- যদি আমাকে কেয়ামত পর্যন্ত জীবন দান করা হয়, তবে আমি আদমের গোটা বংশধরকে পথভ্রষ্ট করে ছাড়বো । এর উত্তরে আল্লাহ্ বলেন ঃ আমার খাঁটি বান্দা যারা, তাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা চলবে না; যদিও তোর গোটা বাহিনী ও সর্বশক্তি এ কাজে নিয়োজিত হয় । বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনা মানুষের সর্বপ্রধান শ্রেষ্ঠত্ব । এছাড়া সুশ্রী চেহারা, সুষম দেহ, সুষম প্রকৃতি এবং অঙ্গসৌষ্ঠব কেবল মাত্র মানুষকেই দান করা হয়েছে । কোন কিছুকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করার ক্ষমতা কেবল মাত্র আল্লাহ্র, আর তিনি যেহেতু সবকিছুর উপরে মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন সেখানে প্রশ্ন তোলার কারো কোন অধিকার নাই ।

‘‘সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম করুন এবং ফজরের কোরান পাঠও । নিশ্চয় ফজরের কোরান পাঠ মুখোমুখি হয় ।’’ আয়াত - ৭৮ ।

অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এ আয়াতটি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ নির্দেশ । এর পূর্ণ তফসীর ও ব্যাখ্যা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কথা ও কাজ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন ।

‘‘রাত্রির কিছু অংশ কোরান পাঠ সহ জাগ্রত থাকুন । এটা আপনার জন্য অতিরিক্ত । হয়তো বা আপনার পালনকর্তা আপনাকে মোকামে মাহমুদে পৌছাবেন ।’’ আয়াত - ৭৯ ।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন সূরা মুযযাম্মেল অবতীর্ণ হয়, তখন পাঞ্জেগানা নামায ফরজ ছিল না, শুধু তাহাজ্জুদের নামায সবার উপর ফরজ ছিল । পরবর্তীতে মে’রাজের পর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হয়ে যাবার সাথে সাথে তাহাজ্জুদ নফল হয়ে যায় । সমগ্র উম্মতের নফল এবাদত তাদের গোনাহের কাফফারা এবং ফরয নামাজ সমূহের ত্রুটি পূরনের উপকারে লাগে । কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) গোনাহ্ থেকে এবং ফরয নামাযের ত্রুটি থেকেও মুক্ত । কাজেই তাঁর পক্ষে নফল এবাদত সম্পূর্ণ অতিরিক্ত বৈ নয় । তাঁর নফল এবাদত কোন ত্রুটি পূরনের জন্য নয়; বরং তা শুধু অধিক নৈকট্য লাভের উপায় । মাকামে মাহমুদ হচ্ছে শাফায়াতে কুবরার মাকাম । হাশরের মাঠে সমস্ত পয়গম্বরের মধ্যে শুধুমাত্র রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ই সমগ্র মানব জাতির জন্য শাফায়াত করার সম্মান লাভ করবেন । এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, শাফায়াতের মর্যাদা অর্জনে তাহাজ্জুদ নামাজের বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান ।

ডান হাতে আমলনামা ঈমানদারদেরকে দেওয়া হবে, পরহেজগার হোক কিংবা গোনাহ্গার । তারা আনন্দ চিত্তে আমলনামা পাঠ করবে, বরং অন্যদেরকেও পাঠ করতে দেবে । এ আনন্দ ঈমান ও চিরস্থায়ী আযাব থেকে মুক্তির হবে যদিও কোন কোন কৃত কর্মের জন্য তাদেরকে শাস্তিও ভোগ করতে হবে ।

‘‘বলুন ঃ সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে । নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল ।’’ আয়াত - ৮১ ।

মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন বায়তুল্লাহ্র চতুর্পাশে ৩৬০ টি মুর্তি স্থাপিত ছিল । এগুলো ভাংগার সময় তিনি উপরের আয়াত পাঠ করছিলেন । তিনি রঙ-বেরঙের চিত্র অঙ্কিত পর্দা ছিঁড়ে ফেলেছিলেন । সহীহ্ হাদিসের বর্ণনায় পাওয়া যায় হযরত ঈসা (আঃ) যখন শেষ যমানায় আগমন করবেন, তখন তিনি খ্রীষ্টানদের ক্রুশ ভেঙ্গে দেবেন ও শুকুর হত্যা করবেন । শিরক, কুফর ও বাতিলের আসবাবপত্র ভেঙ্গে দেয়া যে ওয়াজিব, এসব বিষয় তারই প্রমান ।

‘‘ তারা আপনাকে ’রূহ্’ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে । বলে দিন ঃ রূহ্ আমার পালনকর্তার আদেশঘটিত । এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে ।’’ আয়াত - ৮৫ ।

ইবনে মাসউদের বর্ণনায় হুজুর (সাঃ) কে মদিনায় তার রিসালাতের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য ইহুদীরা উপরোক্ত প্রশ্ন করলে, ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ্র তরফ থেকে উক্ত জওয়াব দেওয়া হয় । রূহ্ সাধারন সৃষ্টজীবের মত উপাদানের সমন্বয়ে এবং জন্ম ও বংশবিস্তারের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেনি; বরং তা আল্লাহ্ তাআলার আদেশ (হও) দ্বারা সৃজিত । বর্তমান জ্ঞানের জন্য আল্লাহ্র প্রতি মানুষের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত এবং অনর্থক ও বাজে গবেষনায় সময় নষ্ট না করা উচিত । বিশেষ করে তা যখন হয় অন্যকে পরীক্ষা করা বা হেয় প্রতিপন্য করার জন্য ।

‘‘ বলুন ঃ যদি মানব ও জ্বিন এই কোরানের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্য জড়ো হয়, এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়; তবুও তারা কখনও এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না । ’’ আয়াত - ৮৮ ।

তাদের অবান্তর প্রশ্ন কোরানকে অবিশ্বাস এবং তা মানব রচিত বলে দাবী করার নামান্তর মাত্র । তাই কোরান সমগ্র মানব ও জ্বিন জাতিকে চ্যালেঞ্জ করে বলছে, তাহ'লে তোমরা অনুরূপ একটা আয়াত বানিয়ে দেখাও । নয়তো কোরানকে আল্লাহ্‌র কালাম মেনে নাও তবে আর রিসালাতে সন্দেহ থাকবে না ।

'' আমরা যখন অস্থিতে পরিণত ও চুর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি আমরা নতুন ভাবে সৃজিত হয়ে উত্থিত হব ?''
আয়াত - ৯৮ ।

তাদের প্রশ্নগুলো ছিল অবিশ্বাসে ভরা এবং রসূলের দাবীকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করা । অথচ রসূলের কাজ শুধু আল্লাহ্‌র পয়গাম পৌঁছান । রসূল খোদায়ী ক্ষমতা লাভ করেন না । তিনি একজন মানব, কাজেই মানবিক শক্তি বহির্ভুত নন । অপরপক্ষে রসূল শুধু মানবই নন; বরং তিনি ফেরেশতাসুলভ ব্যক্তিত্ব এবং মর্যাদারও অধিকারী ।

'' বলুন ঃ যদি আমার পালনকর্তার রহমতের ভান্ডার তোমাদের হাতে থাকত, তবে ব্যয়িত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় অবশ্যই তা ধরে রাখতে । মানুষ তো অতিশয় কৃপণ ।'' আয়াত - ১০০ ।

যদি তোমরা আল্লাহ্‌র রহমতের ভান্ডারের মালিক হয়ে যাও, তবে তাতেও কৃপণতা করবে। কাউকে দেবে না এ আশংকায় যে, এ ভাবে দিতে থাকলে ভান্ডারই নিঃশেষ হয়ে যাবে । যদিও আল্লাহ্‌র রহমতের ভান্ডার কখনই নিঃশেষ হয় না । কিন্তু মানুষ স্বভাবগতভাবে ছোটমনা ও কম সাহসী । অকাতরে দান করার সাহস তার নেই ।

'' আমি সত্যসহ এ কোরান নাজিল করেছি এবং সত্যসহ এটা নাজিল হয়েছে । আমি তো আপনাকে শুধু সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শক করেই প্রেরণ করেছি । '' আয়াত - ১০৫ ।

এ সূরার শেষ আয়াত গুলোতে নাফরমানীর পরিনতি ও কোরানের সত্যতার বর্ণনা করা হয়েছে । হযরত মুসা (আঃ) কে আল্লাহ্‌ পাক যখন ৯ টি নিদর্শন দান করেছিলেন তখন ফেরাউন বলেছিল- মুসা তুমি তো জাদুগ্রস্ত । ফেরাউনকে বলা হয় তুমি ধ্বংস হতে চলেছ । এর পর সে সমস্ত বনী ইসরাঈলীকে দেশ থেকে উৎখাত করতে চাইলে, আল্লাহ্‌ পাক তাকে তার সমস্ত লোক লস্কর সহ পানিতে নিমজ্জিত করে মারেন । এর পরের আয়াত গুলোতে পূর্বের কিতাব সমূহের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, যাদের মধ্যে এর জ্ঞান আছে তারা তো কোরান পাঠ করে সেজদায় লুটিয়ে পড়েছে । কোরান যে অনাহুতো কিছু নয়, পূর্বোপর ঘটনার ধারাবাহিকতাই এর সত্যতা প্রমান করে । অতএব, হে বনী ইসরাঈলরা এবং সমস্ত পৃথিবীর মানুষেরা মনগড়া প্রলাপ বকে কোন লাভ নেই । যদি খাঁটি মনে বিশ্বাস করো তোমরা চির শান্তির অভিষ্ট লক্ষে পৌঁছুতে পারবে অন্যথায় পূর্বের অবাধ্যদের ভাগ্যে যা ঘটেছে তোমাদের জন্যও তা ঘটান আল্লাহ্‌র জন্য এমন কোন কঠিন কাজ নয় ।

এ সূরার সব শেষ আয়াতে আল্লাহ্‌র অপার ক্ষমতার প্রশংসা করা হয়েছে । অতঃপর হুজুর (সাঃ) কে নির্ভয়ে ও পরিপূর্ণ মর্যাদার সাথে আল্লাহ্‌ পাকের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে বলা হয়েছে । এ আয়াতে এরূপ নির্দেশও আছে যে, মানুষ যতই আল্লাহ্‌ তাআলার এবাদত ও তসবীহ্‌ পাঠ করুক, নিজের আমলকে কম মনে করা এবং ত্রুটি স্বীকার করা তার জন্যে অপরিহার্য । - মাযহারী ।

১১তম মাহ্‌ফিল
৯০৮-৩৯৯ মারখাম রোড
রবিবার, ১৩ই জুন, ১৯৯৯
২৮শে সফর, ১৪২০
৩০শে জৈষ্ঠ, ১৪০৬ ।